ATMADEEP

A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-I, September, 2024, Page No. 42-48
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.01W.006

দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার দর্পণে ১৯৪২-৪৩ সালের কাঁথির দুর্ভিক্ষ

মৌসুমী খাতুন, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
E mail: mousumikhatun199@gmail.com

Received: 25.08.2024; Accepted: 27.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

Bengal famine of 1943 was one of the terrible famines during the colonial period that caused millions of deaths and socio-economic crisis. Kanthi sub-division of Midnapur was one of the worst affected regions which is located near coastal area in southern Bengal. Since the end of 1942, a famine situation arisen here. This famine is blamed as 'man-made disaster' by many modern scholars. According to Madhusree Mukherjee the then British Prime Minister Winston Churchill was responsible for the crisis and it was occurred mainly for the economic exploitation of the then British government and the destructive impact of World War II. The rice imports from Burma hampered when Burma was occupied by Japanese soldiers during War. Damage of agricultural crops due to October's cyclone and flood in South Bengal also contributed to the crisis. As a result, food shortage was seen in many parts of India especially in Eastern India. From May 1943, famine occurred in some parts of Bengal province. Within next few months, the entire province faced terrible crisis. An estimated 3.5 million people died due to starvation and severe epidemic diseases. 1943's famine reflects the cruelty of British government because colonial government did not take sufficient relief works to prevent famine. Whatever measures were taken was largely city-centric. Moreover, they wanted to suppress the news of the famine as much as possible. Various NGOs like Hindu Mahasabha, Bengal Relief Committee, Muslim Chamber of Commerce Relief Committee, Ramkrishna Mission and Bharat Sevasram Sangha paid relief work in Midnapur especially at Kanthi and Nandigram. The British Government had to face a lot of criticism. Newspapers were banned to suppress the real facts of the famine. However, British newspaper 'The Statesman' highlighted the plight situation of the people of Bengal at that time.

Key*words*: Statesman Newspapers, Bengal Famine of 1943, Colonial, Kanthi, Midnapur

দুর্ভিক্ষ শব্দটির সাথে আমরা প্রায় সকলেই পরিচিত। কোন স্থানে প্রবলভাবে খাদ্যের অভাব সৃষ্টি হলে তা থেকে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। আর এই খাদ্যের অভাব সৃষ্টি হওয়ার পিছনে থাকে নানান কারন, যেমন বৃষ্টিপাতের অনিয়মিতা, উন্নত প্রযুক্তির অভাব, ফসলের ব্যর্থতা, পরিবহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভিক্ষ হওয়ার পিছনে এইসব কারণগুলি দায়ী থাকলেও শাসন ব্যাবস্থার ব্যর্থতা ও কু-নীতির কারনেও মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হয়, ১৯৪৩ সালে সংঘটিত হওয়া বাংলার দুর্ভিক্ষ তার জ্বলন্ত উদাহরন। এই দুর্ভিক্ষের জন্য উপরিউক্ত কারণগুলি তেমনভাবে দায়ী ছিলনা, এটি হয়েছিলো মূলত বর্বরোচিত ব্রিটিশ কুশাসনের জন্য।[1]

সেই সময় অর্থাৎ ১৯৪০ এর দশক, বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। যুদ্ধের কারনে বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিশালী দেশগুলো পরস্পর দুটি বিপরীত শিবিরে ভাগ হয়ে জোট বাঁধতে শুরু করে। একদিকে থাকে অক্ষশক্তি অন্যদিকে থাকে মিত্রশক্তি। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়ে ব্রিটিশ অধিনস্ত অন্যান্য দেশগুলির মতোই ভারতও এই যুদ্ধে ব্রিটিশপক্ষে জড়িয়ে পরে। সেই সুত্রেই, যুদ্ধ-প্রয়োজনে ইংল্যান্ড তাঁর উপনিবেশিক দেশগুলি থেকে, বিশেষ করে ভারত থেকে প্রচুর পরিমানে রসদ ও যুদ্ধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে শুরু করে। এবং যুদ্ধ যত এগোতে থাকে শোষণের মাত্রা ততই বাড়তে থাকে শোষণের ফলে ভারতের অর্থনীতি প্রায় ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল।[2] আর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে, বাংলা নামক প্রদেশটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো । তার কারন একদিকে ব্রিটিশ শোষণ তো ছিলই, অন্যদিকে যুদ্ধের কারনে বার্মা থেকে বাংলায় চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে বাংলায় চালের সংকট শুরু হয়। বাংলায় চালের আমদানির সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার ছিল এই বার্মা, যুদ্ধে বিরোধী পক্ষ জাপান সেই বার্মা দখল করে নিলে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। এবং শুধুমাত্র আমদানি বন্ধ হয়েছিল এমন নয়, একই সাথে চলছিলো যুদ্ধ প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুত ও রপ্তানি, যার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারন করে।[3]

ঠিক যখন এই রকম এক সংকটময় সময় চলছিলো তখন আগুনে ঘি ঢালার মতো করে, সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে ১৯৪২ সালের তৈরি হওয়া একটি সাইক্লোন। ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবর থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত টানা দুইদিন ধরে চলা এই সাইক্লোন বাংলা আর বিশেষ করে বাংলার সমুদ্র- উপকূলবর্তী এলাকাগুলিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।[4] বাংলার অন্তর্গত মেদিনীপুর আর তাঁর অন্তর্গত কাঁথি ছিল তেমনই এক সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা। জায়গাটি সমুদ্র থেকে মাত্র ১২ কিমি. দূরে অবস্থিত থাকায় ঝড়ে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান অনান্য জায়গার তুলনায় অনেক বেশি হয়েছিল । এই ঝড়ে মানুষ থেকে শুরু করে পশুপাখি, ফসল, ঘরবাড়ী কতই যে নষ্ট হয়েছিল তাঁর হিসেব দেওয়া মুশকিল। তবে ঝড়ে যে কাঁথির অবস্থা সর্বাপেক্ষা খারাপ হয়েছিলো তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাদ্ধ্যায়, তাঁর মেদিনীপুরের ঝড়ের ক্ষতি পরিসংখ্যান অনুযায়ী –" মেদিনীপুর জেলায় মোট মানুষ মারা যায় ১৪৪৪৩ জন, তাঁর মধ্যে কাঁথির ১০৯৪২ জন, তমলুক- ১৯৯৫ জন, মেদিনীপুর – ৪৭৩ জন, ঘাটালে ৩১ জন, ঝাড়গ্রামে-

---

1 Malik, Senjuti, Colonial Biopolitics and the Great Bengal Famine of 1943, Geojournal, Dec 2022, pp-1-2.

2 Mukherjee, Madhushree, *Churchill's Secret war, Tranquebar press, United States*, 2010, pp-23-25.

3 Ghosh,Kalicharan, *Famines in Bengal*, National Council of education , Bengal, Calcutta,1944, pp-38-39.

4 De, Shyamaprasad, The 1942 Cyclone Administration: A Story of Imperial Revenge against the Rebillious Midnapur, Journals of People's History and Culture, Vol-8, December,2022. P-115.

২ জন। মেদিনীপুরে গরু মারা যায় ১৮৮০০০, ঝড়ের পরে কলেরা বা আমাশয়ে মৃত্যু হয় ১৬০০, ক্ষতিগ্রস্ত ১৬০০ গ্রাম, আয়তন ৯০০ বর্গমাইল এলাকা, শস্যক্ষতি ১১ কোটি টাকা, গৃহ ধ্বংস ৫২৭০০।
এই দুর্যোগের ফলে যারা মারা গেলো তারা তো গেলই, যারা বেঁচে ছিল তাদের অবস্থা আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছিল। বিধ্বংসী ঝড়ের ফলে জমানো খাবার,জমির ফসল, এমন কি পানীয় জলও সমুদ্রের জলে লবনাক্ত হয়ে যায় । এমনকি ঝড়ের পরে জমিতে যেটুকু ফসল বেঁচে ছিল তাও সমুদ্রের লবনাক্ত জল ঢুকে ফাঙ্গাস ধরে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে যারা বেঁচে ছিল তাদের মাথার ওপর না ছিল ছাদ আর না ছিল খাবার, বেঁচে থাকা হয়ে উঠেছিল ভয়ঙ্কর।[5] শুধু তাই নয়, এই রকম বিপদের দিনে ব্রিটিশ সরকার কাঁথির উপর অত্যাচার চালাতে পিছুপা হননি। কারণ মেদিনীপুর ছিল অগাস্ট আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান আর তার অন্তর্গত মহকুমা কাঁথি এবং তমলুক ছিল অন্যতম। তাই ব্রিটিশ সরকার এখানকার মানুষদের জব্দ করার জন্য ঝড় পরবর্তী টিকে থাকা ঘরগুলি লুট করতে অথবা সেগুলিকে পুড়িয়ে দিতে শুরু করে, এই রকম অত্যাচারের ফলে অসহায় মানুষ গুলোর অবস্থা আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছিল।[6]

এই রকম যখন করুন অবস্থা চলছিলো তাঁর ঠিক কয়েক মাস পরেই শুরু হল বাংলা জুড়ে ঘরে ঘরে খাদ্যের আকাল অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। এমনিতেই কাঁথির অবস্থা বিপদজনক ছিলই তাঁর উপর খাদ্যের আকাল একপ্রকার এলাকা গুলিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে তুলেছিল। তৎকালীন বিভিন্ন লেখালেখিতে আমরা দুর্ভিক্ষের সময়ের বিভিন্ন করুন চিত্র দেখতে পায়, বিশেষকরে সমসাময়িক পত্রপত্রিকা গুলিতে। তৎকালীন পত্রপত্রিকা গুলির পাতা উল্টালেই আমরা বিশ্বযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন তথ্য খুজে পায়, যা আমাদের সেই সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। তেমনই একটা বিখ্যাত পত্রিকা ছিল দ্য স্টেটসম্যান, যেটি এখনো পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি বজায় রেখেছে। ১৯৪২-৪৩ সালের এই পত্রিকার পাতা খুলে দেখলে আমরা দুর্ভিক্ষের যে তথ্য দেখতে পাই তা থেকে আমরা তখনকার মানুষের অবস্থা ও অসহায়ত্ব খুঁজে পাবো। ব্রিটিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও , দুর্ভিক্ষের কারন থেকে শুরু করে তাঁর ব্যাখ্যা এবং তৎকালীন মানুষের বিধ্বস্ত চেহারাগুলি এই পত্রিকার মাধ্যমে খুব সাহসের সাথে এবং খুব স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই পত্রিকায় উল্লেখিত বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং বিশেষত তৎকালীন মেদনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথির অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৮১৮ সালে J.C. Marshman প্রচলিত এই পত্রিকাটি শুরু হওয়ার পর থেকেই রাজনীতি, সমাজ, খেলাধুলা, অর্থনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম তথ্যবহুল খবর আমরা এখান থেকে পেয়ে এসেছি। । তেমনই ১৯৪২-৪৩ সালে সৃষ্টি হওয়া দুর্ভিক্ষ নিয়েও সমৃদ্ধপূর্ণ বিভিন্ন তথ্যের অভাব নেই। বাংলার বিভিন্ন জায়গা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বিধ্বস্ত কাঁথির করুন অবস্থা পত্রিকায় বার বার উঠে এসছে। কারন একদিকে সাইক্লোন অন্যদিকে ব্রিটিশ সৃষ্ট খাদ্যাভাবে বিধ্বস্ত জায়গাটি খবরের শিরোনামে পরিনত হয়। এই পেপার থেকে নেওয়া দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত তথ্য গুলিকে লেখার সময়, লেখার সুবিধার্থে তিনটি ভাগে ভাগ করে লেখার চেষ্টা করেছি, যেমন - দুর্ভিক্ষের কারন , দুর্ভিক্ষের প্রভাব ও সেই সময় বিভিন্ন রিলিফ কমিটি নিয়ে আলোচনা।

দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় আলোচিত দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন কারণ

---

[5] রাজর্ষি মহাপাত্র, *মেদিনীপুরের জাতীয় আন্দলনের ভিন্নসুর,* প্রভা প্রবাসী, কলকাতা, পাতা- ১০২-১০৫) ।

[6] নন্দ, শান্তিপ্রদ, *মেদিনীপুরের ইতিহাসের উপাদান ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* এগরা রাইটার্স গিলড, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪১৫, pp. ১৫-২১।

১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের কারন নিয়ে নানা জনের নানা মতামত বর্তমান। দ্য স্টেট্সম্যান পত্রিকার বিভিন্ন পাতায় এই দুর্ভিক্ষ এর বিভিন্ন কারন ব্যাখ্যা করা হয়েছে । ব্রিটিশ অব্যাবস্থা, মুদ্রাস্ফিতি , ধান চাষ কমে যাওয়া, অর্থকারী ফসল হিসেবে পাট চাষের প্রবণতা, কালোবাজারি মহাজনদের উৎপাত, খাদ্যশস্য রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়কে প্রধানত দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করা হয়েছে।[7] সমসাময়িক বিভিন্ন লেখনিতেও এই মতামতকে সমর্থন করা হয়েছে, যেমন শ্যামাপ্রাসাদ মুখার্জির বই ***পঞ্চাশের মন্বন্তর***[8] , তারকচন্দ্র দাসের বই ***Bengal Famine 1943***,[9] কাশিনাথ চট্টোপাধ্যায় এর ***উপোসি বাংলা***,[10] Srijit Haridas Majumdar এর বই ***Shadow of Famine***[11] বইতেও দুর্ভিক্ষের কারন হিসেবে প্রায় এই বিষয় গুলিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

কাঁথির উপর দুর্ভিক্ষের প্রভাব

প্রায় পুরো বাংলায় দুর্ভিক্ষের প্রভাব নিয়ে এই পত্রিকাটিতে কম বেশি আলোচিত হয়েছে, তবে কাঁথির অবস্থাটা যেন বার বার আমরা দেখতে পাই। দুর্ভিক্ষে কাঁথির ওপর প্রভাব ও সেখানে তৈরি হওয়া রিলিফ কমিটি নিয়ে এখন আলোচনা করবো। কাঁথি মহকুমা সম্পর্কে দ্যা সানডে স্টেট্সম্যান , ২৯ অগাস্ট ১৯৪৩ এ কিছু ক্ষুধার্ত মানুষের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তৎকালীন নেতা জগদীশ প্রসাদের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দেওয়া হল (তাঁর বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ) –" সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মেদিনীপুর জেলা ও তাঁর অন্তর্গত কাঁথি নামক জায়গাটি । আমি টানা মার্চ মাস থেকে এখানে আছি এবং মানুষের স্বাস্থের অবিরাম অবনতি দেখছি। বিভিন্ন জেলা অধিকারিকরা চেষ্টা করলেও অবস্থার অবনতি ছাড়া উন্নতি হচ্ছে না। প্রতিদিন শুধু দেখতে পাচ্ছি লাশ আর লাশ ,আরও দেখতে পাচ্ছি সেই লাশের অংশ নিয়ে কুকুর ও শকুনের মধ্যে লড়াইয়ের দৃশ্য। ভিক্ষুক, মৃতদেহগুলি যেন সংক্রামক রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মহকুমার অন্তর্গত গ্রামগুলির অবস্থা আরও খারাপ। প্রচুর পরিমানে মানুষ অনাহারে ও মহামারিতে মারা যাচ্ছে। মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতাসম্পন্ন লোক নেই। লাশগুলি প্রায়শই খালে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আপনি যদি কনটাই বা কাঁথি থেকে পানিপলা পর্যন্ত খালটিতে যান তবে আপনি অসুস্থ বোধ করবেন, ফুটে উঠবে অসংখ্য লাশ আর লাশ।[12]

শ্রীমতী বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত যিনি সেই সময় ALL INDIA WOMEN CONFERENCE এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি দুর্ভিক্ষের সময় বাংলা পরিদর্শন করে জানান- পুরো বাংলা জুড়ে খাদ্যের অভাব এবং রোগ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে । প্রচুর পরিমানে মানুষ অনাহারে, ম্যালেরিয়ায় ও কলেরায় মারা যাচ্ছে। সরকারি ভাবে তেমন কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না এবং কিছু হাসপাতাল আছে যেখানে হাসপাতাল গুলিতে ডাক্তার থাকলেও ওষুধ নেই।

তিনি আরও বলেন- (তাঁর কথার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হল) "আমি খড়গপুর ও কাঁথির মাঝামাঝি এলাকায় তিনটি মৃতদেহ ও ৫ টি কঙ্কাল দেখতে পেলাম। যার মধ্যে একটি দেহের অঙ্গ আগেই কুকুরে খেয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল এবং বাকি অংশটা শকুনে খাচ্ছে। একটা বৃদ্ধের দেহ এমন অবস্থা হয়েছিলো তা বর্ণনা করা দুস্কর। মৃতদেহগুলি খালে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো যার দুর্গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। তিনি আরও

---

[7] The Statesman (food situation in Bengal)- 13 July 1943, p 1-3

[8] মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রাসাদ, *পঞ্চাশের মন্বন্তর*, বেঙ্গল পাবলিশারস, কোলকাতা, ১৩৫০, পাতা- ৩-৪।

[9] Das, Tarakchandra, Bengal Famine (1943), University of Calcutta, 1949, pp- 97-99.

[10] চট্টোপাধ্যায়, কাশিনাথ, *উপোসি বাংলা -সমসাময়িক পত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর* (বসুমতি পত্রিকা, শ্রাবন, ১৩৫০), সেরিবান, কোলকাতা, ২০০০, pp- ১১৮-১২০।

[11] Majumdar, Haridas, *The Shadow of Famine,* Bani Press, Kolkata, 1944, pp-5-6.

[12] The Statesman, 29 august, 1943, p-2.

বলেন কাঁথির শ্রমিক ও কৃষকরা তাদের কাছে থাকা সমস্ত কিছু বিক্রি করে শহরের দিকে চলে যাচ্ছে এবং গ্রাম প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ছে।[13]

এছাড়াও T.G.Devis (সেই সময়ে গঠিত হওয়া ফ্রেন্ডস আম্বুলেন্স নামক রিলিফ কমিটির সদস্য), যিনি সায়ক্লনের ৯ মাস পর কাঁথি পরিদর্শন করে তাঁর প্রত্যক্ষ বিবরণীতে জানান – "সব জায়গার জল এখনো দূষিত। সাইক্লনের ৯ মাস পরেও এই অবস্থা। কাঁথির রামনগর, খাজুরির মত গ্রাম গুলিতে দুর্ভিক্ষের পর পরই কলেরা, ম্যালারিয়া, আমাশয় রোগগুলি মহামারি আকার ধারন করেছিল।[14] শ্রীমতী বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিতের মতো তিনিও লক্ষ্য করেন গ্রাম গুলিতে হাসপাতাল থাকলেও কোন ওষুধ ছিল না।
সেই সময়ের রচিত হওয়া বিভিন্ন গ্রন্থেও আমরা দুর্ভিক্ষের সময়ের কাঁথির কিছু ভয়ানক অবস্থার বর্ণনা পায়। শ্যামাপ্রাসাদ মুখার্জি যিনি সেই সময়ের একজন খ্যাতিসম্পন্ন মন্ত্রী ছিলেন, তিনি দুর্ভিক্ষের সময় নিজে কাঁথিতে গিয়ে পরিদর্শন করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত বই *রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়* এ দুর্ভিক্ষ ও সরকারি অত্যাচারের ফলে যে কাঁথির লোমহর্ষক অবস্থা হয়েছিলো তাঁর প্রত্যক্ষ বর্ণনা তুলে ধরেন।[15] এছাড়াও T.G.Narayan যিনি সেই সময়েই দুর্ভিক্ষ নিয়ে প্রচুর পরিমানে গবেষণা চালিয়েছিলেন, তিনি তাঁর কাজের তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯৪৩ এর নভেম্বর মাসে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ চলাকালীন সময়েই কাঁথিতে যান, তিনি পায়ে হেঁটে ও নৌকার মাধ্যমে প্রায় ২০০ কিমি. ঘুরে দেখেন। তাঁর যাত্রাপথে তিনি রাস্তার ধারে ধারে লাশের খুলি পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি আরও বলেন মানুষের কাছে তখনও পর্যন্ত খাবার বা পানীয় জল কিছুই ছিল না। শিশুরা মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল এবং গ্রামের কুঁড়েঘর গুলি খালি ও গ্রাম প্রায় জনশূন্য।[16]

'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায় আলোচিত দুর্ভিক্ষে ত্রান ব্যবস্থা

৪৩-এর দুর্ভিক্ষ যেমন ভয়াবহ হয়েছিলো তাঁর তুলনায় ত্রান ব্যাবস্থা ছিল খুবই সীমিত। সরকারি হিসেব অনুযায়ী প্রায় ২০-৩০ লক্ষ মানুষ এই দুর্ভিক্ষে মারা যায়। দুর্ভিক্ষের সময় সরকারের ত্রান দেওয়ার কোন মানসিকতা না থাকলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন নিউজ পেপার এবং বিভিন্ন সংস্থানের মাধ্যমে মেদিনীপুরের বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষের বিষয়টা ছড়িয়ে পড়লে সরকার মেদিনীপুরের উপর লোক দেখানো দয়া দেখানোর চেষ্টা করে এবং কিছু অপর্যাপ্ত ত্রান পাঠানোর ব্যাবস্থা করে। সরকার মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষ ও সেখানে ত্রানের ব্যাবস্থা দেখার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন যার প্রধান হিসেবে সুদক্ষ আই, সি,এস অফিসার বি.আর.সেনকে নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের পরিক্ষা-নিরীক্ষা ও দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা যাচাই করে মেদিনীপুরে কিছু ত্রান পাঠানোর ব্যাবস্থা করেন।[17] কিন্তু মেদিনীপুরে সরকার প্রেরিত ত্রান যে পর্যাপ্ত ছিলনা তা নিয়ে তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী T.N Mukherjee এবং Mr. Banerjee, (যিনি সেই সময়ের একজন আইসিএস অফিসার ছিলেন) বিধ্বস্ত জেলা মেদিনীপুর জেলা ঘুরে আসার পর সেখানে তৈরি করা বিভিন্ন রিলিফ কমিটি সম্পর্কে বলেছেন। তাদের বক্তব্য- "যেখানে যেখানে দরকার বিনামুল্যে রান্নাঘর খোলা হয়েছে কিন্তু বন্যা ও দুর্ভিক্ষের ফলে সেখানকার মানুষের প্রচুর পরিমানে ক্ষতি হয়েছে, মানুষের কাছে কিছুই খাবার

---

13 The Statesman, 25-10-1943, p-2; দেশ পত্রিকা, ১৩ কার্ত্তিক, ১৩৫০

14 The Statesman, 15-7-1943, p-2.

15 মুখার্জি, শ্যামাপ্রাসাদ, রাষ্ট্রসংগ্রামের এক অধ্যায়, কলকাতা, প-৯৬।

16 T.G. Narayan, Famine over Bengal, The book company, Calcutta; রাজর্ষি মহাপাত্র, *মেদিনীপুরের জাতীয় আন্দলনের ভিন্নসুর*, প্রভা প্রবাসী, কলকাতা, p. ১০২-১০৫।

17 মহাপাত্র, রাজর্ষি, *মেদিনীপুরের জাতীয় আন্দলনের ভিন্নসুর*, প্রভা প্রবাসী, কলকাতা, পাতা-১০৫।

নেই, সেখানে এখনো প্রচুর পরিমানে ত্রান পাঠানো দরকার।[18] এই পত্রিকায় শুধুমাত্র ত্রান পাঠানোর কথা আলোচনা করে পাট চুকিয়ে ফেলা হয়নি, এই পত্রিকার বিভিন্ন পাতায় ত্রানের পরিমানের হিসেবও খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই প্রবন্ধে পত্রিকায় তুলে ধরা দু একটি ত্রানের পরিমান নিচে দেওয়া হল – "**মিদনাপুর ঘূর্ণিঝড় ত্রাণ**" নামক প্রবন্ধে ৩১ জুলাই ১৯৪৩ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ে ও দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত ব্যাক্তিদের ত্রানের জন্য নিম্নোক্ত বিবরন দেওয়া হয়েছে- (অনুবাদ) "চাল দেওয়া হয়েছে ৯৩,৮০২ মন এবং ১০০০০০ মন সরকারি চাল বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বিতরন করা হয়েছে। কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে পুরো জেলায় মোট নগদ – ৬১,৬৩১২৮ এবং সাধারণ লোণ দেওয়া হয়েছে ১৩৭,৩৯৫ টাকা। কাঁথিকে ৬৬ হাজার ৬৩৫ টাকা লোণ দেওয়া হয় । পুরো মেদিনীপুরের জন্য ৬০,৯৭২৪৪ টাকা রিলিফ হিসাবে দেওয়া হয় যার মধ্যে ৩৫,৬৫৫ টাকা কাঁথিতে এবং ২২,০৬৫ তমলুক মহকুমার জন্য।[19]

পরবর্তী এক ***Relief Work in Bengal*** নামক প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে "কলকাতা এবং জেলাগুলিতে রিলিফ সেন্টার খোলা হয়েছে। বেশ ভালো সংখ্যক রান্নাঘর বাংলার অন্যান্য জেলাতেও খোলা হয়েছে। According to press note issued by the director of public information, "বাংলার মধ্যে ২৪৪২ টি Free Kitchen খোলা হয়েছিল। যার মধ্যে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমা তে ১২৪ টা।"[20] কিন্তু এত সংখ্যায় ত্রান এত রান্নাঘর সবই যে লোক দেখানো ছিল তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন শ্রীমতী বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত, তাঁর ভাষায়- "সরকারি ভর্তুকি দেওয়া রান্নাঘর সংখ্যায় কম নয়,কিন্তু তাতে দান করা ত্রানের পরিমান ছিল খুবই কম, সরকার কিছু অঞ্চলে ভর্তুকিযুক্ত চিকিৎসকও পাঠিয়েছেন কিন্তু তাদের কুইনাইন বা অন্য কোন ওষুধ সরবরাহ করা হয় না। সরকার খুব বাজে ভাবে পরিস্থিতির উন্নতির চেষ্টা করছেন। এইভাবে চলতে থাকলে বাংলাকে আরও বড় ধরনের খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে।[21] এই প্রসঙ্গে ক্ষিতীশ চন্দ্র মহাশয় বলেন- "যে পরিমান খাবার পীড়িত মানুষের জন্য দেওয়া হতো তা দিয়ে একটা বড় ইঁদুরেরও পেট ভরবেনা। রাজন নেহেরু, (Mr. Rajan Neheru) **Secretary of All India Women Conference, Delhi,** তাঁর বক্তব্য একটি প্রবন্ধ হিসেবে বের হয় স্টেটস ম্যান পত্রিকায়, যেখানে তিনি জানান, তিনি দুর্ভিক্ষের সময় একটি মেডিকেল টিম নিয়ে বাংলার বিভিন্ন গ্রামে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি মেদিনীপুরে কাটানো এক সপ্তাহের স্মৃতি মনে করতে গিয়ে শিহরিত হয়েছেন এবং বলেছেন যে এত খারাপ অবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেখানে সমস্যা সমাধানের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিলো না, যা দ্রুত ও কার্যকরী ভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারবে। প্রায় শত শত মানুষ মারা যাচ্ছিল ক্ষুধার্ত হয়ে।[22]

শুধুমাত্র এই পত্রিকাতেই নয়, তৎকালীন বিভিন্ন সরকারি নথিপত্রেও আমরা ত্রান কমিটির ব্যর্থতা সমন্ধে জানতে পারি। যেমন- তৎকালীন ভারত সচিব রাদারফোর্ড বড়োলাট ওয়াভেল কে একটা চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছিলেন, যানবাহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারনে ত্রান সামগ্রী মেদিনীপুরের গ্রামগুলিতে পৌঁছায়নি।[23] রাদারফোর্ড এর চিঠি পাওয়ার পর তৎকালীন বড়োলাট ওয়াভেল স্বয়ং মেদিনীপুরের কাঁথিতে যান এবং তিনি তাঁর চিঠিতে ত্রান সামগ্রী কমতি, ওষুধের কমতি, ও কাঁথির সাধারন মানুষের করুন অবস্থার

[18] The Statesman, 17-7-1943, p-2.
[19] The Statesman- 25-8-1943, p-2.
[20] Ibid- 26-9-1943, p-3.
[21] The Statesman,25-10-1943, p-2.
[22] Ibid-26-10-1943, p- 3.
[23] রাদারফোর্ড চিঠি, সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৪৩, ৪নং খন্ড, ১৫৮ নং চিঠি।

কথা তুলে ধরেন।[24] বেসরকারি বেশ কিছু সংস্থাও তাদের মত করে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলো কাঁথির দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের সাহায্য করার জন্য। যেমন মাড়োয়ারি রিলিফ কমিটি, হিন্দু মহাসভা, রামকৃষ্ণ মিশন, বেঙ্গল রিলিফ কমিটি ইত্যাদি। তারা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেছিলো কাঁথির অবস্থার উন্নতি করতে, কিন্তু সরকারি অভাব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য তাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন হতে হয় যার ফলে তারা অবস্থার খুব একটা উন্নতি করতে পারেনি।[25]

উপসংহার

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে, কাঁথির দুর্দশা বিধ্বংসি পরিণতির এক জীবন্ত দলিলে পরিণত হয়েছে। এই পত্রিকার দ্বারা কাঁথির জনগণের উপর হওয়া বিপর্যয় ও তাঁর পরিনতির বিভিন্ন স্তরগুলিকে সুক্ষভাবে উন্মোচন করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং দুর্ভিক্ষের কঠোর বাস্তবতার মধ্যে তাদের টিকে থাকার সংগ্রামের একটি প্রাণবন্ত চিত্র হয়েছে। এখানকার জনসংখ্যার প্রায় ৫০% নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষ তাদের শেষ করেনি দুর্ভিক্ষের পরপরই সংঘটিত হওয়া মহামারী এলাকাটির অবস্থা আরো শোচনীয় করে তুলেছিল। দুর্ভিক্ষে মানুষের আর্তনাদ ও তার মাঝে ব্রিটিশ অত্যাচারের করুণ চিত্র আমরা ইতিহাসের প্রতিটা পাতায় খুঁজে পাবো। আর এই ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে ফুটে ওঠা দৃশ্য। মেদিনীপুরের ত্রাণ কমিশনার বি আর সেন তদন্ত প্রকাশ করেন, তিনি বলেন গ্রামের ১৫০ জনের মধ্যে মাত্র একজন বেঁচে আছে এবং অন্য একটি গ্রামে ১৩৬ জনের মধ্যে চারজন বেঁচে ছিল যার ১৩২ জন মারা গেছে। শতকরা ৫০% মানুষ পানীয় জলের অভাবে বাসভূমি ছেড়ে চলে গেছে। এই নিবন্ধটিকে ইতিহাসের লেন্সের মাধ্যমে বিচার করলে দেখতে পাবো এটি শুধুমাত্র কাঁথির দুঃখ কষ্টের বর্ণনাই করেনা বরং একটি সতর্কতা মূলক গল্প হিসেবেও কাজ করে, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয় । টেকসই কৃষি ব্যবস্থা কার্যকর এবং সুরক্ষিত শাসন ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রশমিত করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্বের ওপরও জোর দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

[24] মহাপাত্র ,রাজর্ষি, *মেদিনীপুরের জাতীয় আন্দলনের ভিন্নসুর*, প্রভা প্রবাসী, কলকাতা, পাতা-১১১।

[25] Ibid-106-107.